জীবন্ত নামায

অধ্যাপক গোলাম আযম

এ বই কেন?

ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির মধ্যে কালেমা তাইয়েবার পরই নামাযের স্থান। যারা নিজেদেরকে মুসলমান মনে করে, তারা নামায সবাই না পড়লেও এটাকে আল্লাহর হুকুম বলে স্বীকার করে। যারা নিয়মিত নামায আদায় করে তাদের সংখ্যা নগণ্য নয়। কুরআন ও হাদীসে নামাযের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা সব নামাযীর জীবনে পূরণ হয় না কেন?

আমাদের নামায শিক্ষার পদ্ধতিটিই অপূর্ণ। নামাযে কিরাআত ও তাসবীহসমূহ শুদ্ধ করে পড়া এবং রুকু-সিজদা সুন্দরভাবে আদায় করা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যথাস্থানে রাখা ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। এটুকু শিক্ষাও অনেক নামাযীর নেই। মসজিদে নামাযীদের দিকে লক্ষ্য করলেই তা বুঝা যায়।

নামাযে যা পড়তে হয় তা যারা শুদ্ধ করে পড়তে ও রুকু-সিজদা সঠিকভাবে আদায় করতে শিখেছে, তারাও নামাযে কোন্ অবস্থায় মনে কী খেয়াল করতে হবে তা শেখার সুযোগ পায়নি। এ বিষয়ে সাধারণত শিক্ষা দেওয়াই হয় না। ফলে নামায আদায় করার সময় মনটা খালি থেকে যায়। দেহটা জায়নামাযে থাকলেও মনটা নামাযের বাইরে বিচরণ করে। মন খালি থাকলে শয়তানের কারখানায় পরিণত হওয়াই স্বাভাবিক।

এ কারণেই শয়তান যাদেরকে নামায পড়া থেকে ফিরাতে পারে না, তাদের নামায নষ্ট করার সুযোগ সহজেই পেয়ে যায়। মনটাকে নামাযের সময় কোন ভাবনায় নিয়োগ না করায় শয়তান নামাযীর মনে নামাযের বাইরের হাজারো কথা হাযির করে।

আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা নামাযে যা কিছু করি, তাতে শুধু নামাযের দেহ তৈরি হয়। মানুষের প্রাণহীন দেহ যেমন কোন কাজে লাগে না, প্রাণহীন নামাযও নামাযের উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে না। তাই আমাদের নামাযকে জীবন্ত নামাযে পরিণত করতে হবে। যারা জীবন্ত নামাযের অধিকারী হতে চান, তাদের জন্য এ বইটি সহায়ক হবে বলে আশা করি।

আল্লাহ তাআলা আমার এ আশা পূরণ করুন।

গোলাম আযম
জুলাই, ২০০২

www.bjilibrary.com

সূচিপত্র

জীবন্ত নামায	৫
কালেমা শিক্ষার বিভিন্ন দিক	৬
নামায শিক্ষার বিভিন্ন দিক	৭
নামাযের দেহ	৯
নামাযের রূহ	১১
নামাযের মর্যাদা	১৯
বিতরের নামায	২১
নামাযের প্রধান মাসআলা-মাসাইল	২৩
নামাযে সমস্যা	২৪
জীবন্ত নামাযের নমুনা	২৫
রাসূল (স)-এর নামায	২৫
সাহাবায়ে কেরামের নামায	২৫
নামাযের শেষে দোয়া	২৬
নামায ও নামাযের বাইরের জীবন	২৭
নামাযের বাইরে মনকে কী কাজ দেওয়া যায়	২৭
কতক বাস্তব পরামর্শ	২৯
নামায বহু কিছু শেখায়	৩০
মুমিনের সাফল্যের হাতিয়ার	৩১
শেষকথা	৩১

www.bjilibrary.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

জীবন্ত নামায

নামায কালেমায়ে তাইয়েবার পয়লা বাস্তব আমলী স্বীকৃতি।

কালেমায়ে তাইয়েবার মধ্যে যে দুটো কথা স্বীকার করা হয়, তা বাস্তব জীবনে মেনে চলার ট্রেনিংই হলো নামায। কালেমা ও নামাযের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ।

ধরুন, এক ব্যক্তি ইসলাম কবুল করে মুসলিম সমাজের সদস্য হয়ে গেল। কালেমায়ে তাইয়েবা উচ্চারণ করে সে তার জীবনের দু'দফা পলিসী ঘোষণা শুরু করল।

১. আমি জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর হুকুম মেনে চলব। আল্লাহর হুকুমের বিরোধী কারো হুকুম পালন করব না।

২. রাসূল (স) আল্লাহর হুকুম যে নিয়মে পালন করেছেন, আমি একমাত্র ঐ তরীকায়ই আল্লাহর হুকুম পালন করব। আর কারো কাছ থেকে কোন নিয়ম বা তরীকা গ্রহণ করব না।

এ ঘোষণার ফলে সে মুসলিম মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। সে কালেমায়ে তাইয়েবা কবুল করে ইসলামের ৫টি বুনিয়াদের (ভিত্তির) প্রথমটি গ্রহণ করার ঘোষণা দিল। এখন বাকি ৪টি ভিত্তি তাকে মেনে চলতে হবে। এর মধ্যে প্রথমে নামায। যদি কেউ সকালে ইসলাম গ্রহণ করে থাকে তাহলে যোহরের নামাযেই তাকে মসজিদে জামাআতে শরীক হতে হবে। যা যা পড়তে হয় তা শিখতে কিছু দিন লাগতে পারে, কিন্তু সে অপেক্ষায় এক ওয়াক্ত নামাযও বাদ দিতে পারবে না। নামাযে যা পড়তে হয় এর যেটুকু শেখা বাকি আছে ঐটুকুর জায়গায় শুধু সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ পড়তে থাকবে। এভাবে কালেমা কবুলের সাথে সাথেই তার উপর নামায ফরয হয়ে গেল।

রমযান মাস আসলে তাকে রোযা রাখতে হবে। তার নিকট যাকাত দেওয়ার নিসাব পরিমাণ মাল থাকলে এক বছর পর যাকাত আদায় করবে। হজ্জ করার সাধ্য থাকলে হজ্জের মওসুমে হজ্জ আদায় করবে। কিন্তু নামায এমনই এক ইবাদত, যা কালেমা কবুলের পর পরবর্তী নামাযের ওয়াক্তেই তাকে আদায় করতে হবে।

কালেমা কবুলের পরপরই নামাযে শামিল হয়ে সে বাস্তবে স্বীকৃতি দিল যে, সে সত্যিই কালেমা কবুল করেছে। কালেমার দু'দফা ঘোষণা অনুযায়ী সে নামাযের হুকুম পালন শুরু করে দিল। এভাবেই নামায হলো কালেমায়ে তাইয়েবা কবুল করার বাস্তব আমলী স্বীকৃতি।

www.bjilibrary.com

কালেমা-শিক্ষার বিভিন্ন দিক

১. কালেমা তাইয়েবা শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে হবে।
২. কালেমার শাব্দিক অর্থ জানতে হবে।
৩. কালেমার মর্মকথা বুঝতে হবে।
৪. কালেমার ওয়াদা পালন করতে হবে।

কালেমার শাব্দিক অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল।

কালেমার মর্মকথা ঃ জীবনের সকল ক্ষেত্রে, সবসময়, সব অবস্থায় আল্লাহকে একমাত্র হুকুমকর্তা, (ইলাহ) প্রভু মানতে হবে এবং আল্লাহর হুকুমের বিরোধী কারো হুকুম মানা যাবে না।

আর মুহাম্মদ (স)-এর নিকটই আল্লাহর হুকুম এসেছে এবং তিনি আল্লাহর শেখানো নিয়মে আল্লাহর হুকুম পালন করেছেন। কালেমা কবুলকারীকে একমাত্র রাসূল (স)-এর নিয়ম বা তরীকা অনুযায়ী আল্লাহর সব হুকুম পালন করতে হবে।

ময়না বা টিয়া পাখিকে শেখালে কালেমা পড়তে পারে; কিন্তু সে কালেমা বুঝে কবুল করতে পারে না। তাই পাখি কালেমা উচ্চারণ করতে পারা সত্ত্বেও মুমিন বলে গণ্য হবে না। ঈমানের দাবি হলো, কালেমার শব্দগুলো মুখে উচ্চারণ করে মনে এর মর্ম বুঝে কবুল করতে হবে।

اِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ-এর সাথে সাথে تَصْدِيْقٌ بِالْجَنَانِ হতে হবে। অর্থাৎ মুখে স্বীকার করার সাথে সাথে মনেও কবুল করতে হবে।

উদাহরণ ঃ পানি একটি শব্দ। কিন্তু শব্দটিতে পানি নেই। পানি একটি জিনিস, যা এ শব্দ দ্বারা বুঝা যায়। পিপাসা দূর করতে হলে পানি পান করতে হবে। পানি পানি জপলে পিপাসা আরও বাড়বে। কারণ পানি শব্দে কোন পানি নেই। তেমনি কালেমায়ে তাইয়েবার শব্দগুলো কালেমা তাইয়েবা নয়। এর মর্মকথাটাই আসল কালেমা।

কালেমার ওয়াদা ঃ কালেমার মর্মকথা কবুল করার মাধ্যমে এ ওয়াদাই করা হলো যে, আমি একমাত্র আল্লাহর হুকুম মেনে চলব, তার হুকুমের বিরোধী কারো হুকুম মানব না এবং আমি আল্লাহর সব হুকুম একমাত্র রাসূল (স)-এর শেখানো তরীকা অনুযায়ী পালন করব এবং অন্য কারো কাছ থেকে তরীকা নেব না।

কালেমা কবুল করার মধ্যে এ ওয়াদা যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তা অস্বীকার করা যায় না। এ ওয়াদা ছাড়া কালেমা কবুল করা অর্থহীন। কালেমা গ্রহণ মানেই ঐ দু'দফা ওয়াদা

www.bjilibrary.com

করা।

নামায-শিক্ষার বিভিন্ন দিক

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে নামায আদায় করেছেন ঠিক সেভাবেই নামায পড়তে হবে।

২. নামাযে তিনি যে অবস্থায় যা পড়েছেন তা শুদ্ধ করে পড়া শিখতে হবে এবং তা ঠোঁট ও জিহ্বা নেড়ে উচ্চারণ করতে হবে। (মনে মনে পড়লে চলবে না)।

৩. কালেমার ওয়াদা অনুযায়ী চলার ট্রেনিং হিসেবে নামায আদায় করতে হবে। নামাযে দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করতে হয়। বিভিন্ন অবস্থায় হাত বিভিন্নভাবে রাখতে হয়। বিভিন্ন অবস্থায় নির্দিষ্ট স্থানে চোখে তাকাতে হয়। রুকু ও সিজদা বিশেষ নিয়মে করতে হয়। এসবই রাসূল (স) শিক্ষা দিয়েছেন।

নামাযে এ শিক্ষাই দেওয়া হয় যে, দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেভাবে নামাযে আল্লাহ ও রাসূলের শেখানো নিয়মে ব্যবহার করা হয়, নামাযের বাইরেও এসবকে আল্লাহ ও রাসূলের মরযী মত ব্যবহার করতে হবে। নিজের মরযী মত ব্যবহার করা চলবে না। এভাবেই নামাযের শিক্ষাকে বাস্তব জীবনে কায়েম করতে হবে। কুরআনে নামায কায়েম করতেই হুকুম করা হয়েছে; শুধু পড়তে বলা হয়নি।

৪. নামাযে মনের ট্রেনিং আরও গুরুত্বপূর্ণ। মনই তো আসল। নামাযকে কালেমার ট্রেনিং হিসেবে মনে করলেই তো বাস্তব জীবনে নামাযের শিক্ষাকে কাজে লাগানো সহজ হবে।

মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা মুমিনের ২৪ ঘণ্টার রুটিন ৫ ওয়াক্ত নামাযের নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যবস্থাই করেছেন। এ রুটিন শুরু হবে ফজরের নামায দিয়ে এবং শেষ হবে ইশার নামায দিয়ে। মাঝখানে ৩ বার দুনিয়ার দায়িত্ব মুলতবী রেখে নামাযে হাযির হতে হবে। নামায নির্দিষ্ট সময়ে পুরুষদেরকে মসজিদে জামাআতে আদায় করতে হবে। অন্য কোন কাজের জন্য নামাযকে মুলতবী করা চলবে না। এভাবে ২৪ ঘণ্টার রুটিন নামায দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

সকালে ঘুম থেকে উঠার পর নামাযই পয়লা কাজ। এর আগে পেশাব- পায়খানা ও ওযূ গোসল তো আসলে নামাযেরই প্রস্তুতি। এগুলো দুনিয়ার কোন দায়িত্ব নয়। দুনিয়ার কাজ শুরু করার পূর্বে নামাযের মাধ্যমে এ চেতনা দান করা হলো যে, "তুমি তোমার জীবন যেমন খুশি তেমনি যাপন করতে পারবে না। তুমি স্বাধীন নও, তুমি আল্লাহর

www.bjilibrary.com

গোলাম।"

ফজরের নামাযেই এ চেতনা নিয়ে নামায আদায়ের পর নামাযের বাইরেও এ চেতনা জাগ্রত রাখতে হবে। নামাযের বাইরে দুনিয়ার দায়িত্ব পালন করতে করতে এ চেতনা ঢিলা হয়ে যায়। তাই বার বার যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার নামাযে হাযির হয়ে কালেমার ট্রেনিংকে ঝালাই করতে হয় এবং ঐ চেতনাকে শান দিতে হয়।

আল্লাহু আকবার বলে নামায শুরু করার পর সালাম ফিরানোর পূর্ব পর্যন্ত দেহ ও মনকে একমাত্র আল্লাহর হুকুম ও রাসূল (স)-এর তরীকা অনুযায়ী ব্যবহার করতে হয়। কেউ বেশি সওয়াবের নিয়্যতে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার জায়গায় সূরা ইয়াসীন পড়লে নামায হবে না। নিজের মরযী মত নামাযে কিছুই করা যাবে না। আল্লাহর হুকুম ও রাসূল (স)-এর তরীকা মতই নামাযে সবকিছু করতে হবে।

এভাবে ৫ ওয়াক্ত নামাযে কালেমার যে ট্রেনিং হয়, তা নামাযের বাইরে কায়েম করতে পারলেই নামাযের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। নামায বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কোন অনুষ্ঠান নয়। জীবনের সব ক্ষেত্রে নামাযের ট্রেনিংকে কাজে লাগাতে হবে। এটাই নামাযে মনের ট্রেনিং। মনকে নামায থেকে বিচ্ছিন্ন করা চলবে না। ফজরের পর মসজিদে মনকে ঝুলিয়ে রেখেই বাইরে যেতে হবে। মন সারাদিন নামাযের সময় সম্পর্কে সচেতন থাকবে।

৫. নামাযের বিভিন্ন অবস্থায় মনটাকে কাজ দিতে হবে, যাতে মন নামাযের বাইরে চলে না যায়। নামাযে মন অনুপস্থিত হলেই মনে শয়তান এমন সব ভাবনা হাযির করে, যা নামাযের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ করে দেয়। নামায শেখার সময় এটা সাধারণত শেখানো হয় না। এটা অবশ্যই শিখতে হবে। আমরা দেহ দ্বারা নামাযে যা করি, তাতে নামাযের দেহ তৈরি হয়। আর মনে যদি সঠিক ভাবনা থাকে তবেই নামাযে প্রাণ সঞ্চার হয় বা নামায জীবন্ত হয়। তাই নামাযে কোন্ অবস্থায় মনে কোন্ ভাবনা থাকতে হবে তা জানতে হবে ও তা অভ্যাস করতে হবে। নামাযে যখন যা পড়া হয় এর মর্মকথাই ভাবনায় থাকতে হবে।

নামাযে সবকিছুই আরবীতে পড়তে হয়। যারা আরবীর অর্থ বুঝে না তারাও মর্মকথাটা জেনে নিতে পারে। টাকার নোটের লেখা যারা পড়তে জানে না তারাও কোন্‌টা কত টাকার নোট তা চিনে নেয়। তেমনি নামাযে আরবীতে যখন যা পড়া হয় এর মর্মকথা জেনে নিতে হবে। আরবীটুকু মুখস্থ করতে যে সময় লাগে এরও কম সময়ে তা শেখা সম্ভব। মুখে উচ্চারণ করবে, আর মনে মর্মকথাটুকু জাগ্রত রাখবে।

www.bjilibrary.com

৬. কালেমায়ে তাইয়েবার মধ্যে যেমন ওয়াদা রয়েছে, তেমনি নামাযেও প্রচ্ছন্নভাবে ওয়াদা করা হয়।

গোটা নামাযে এ ওয়াদা উহ্য রয়েছে যে, "হে আমার মাবূদ, নামাযে যেমন তোমার হুকুম ও রাসূল (স)-এর তরীকা মত সবকিছু করেছি, নামাযের বাইরেও আমি সেভাবেই করব। আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নামাযে যেমন আমার মরযী মত ব্যবহার করিনি; নামাযের বাইরেও তা আমার মরযী মত ব্যবহার করব না। নামাযে যে মুখে তোমার পবিত্র কালাম উচ্চারণ করেছি, নামাযের বাইরেও তোমার অপছন্দনীয় কথা মুখে আনব না।

নামাযের রুকুতে আমার যে মাথা তোমার দরবারে নত করে গৌরবের ভাগী হয়েছি, সে মাথাকে আর কোন শক্তির সামনে নত করে অপমানিত করব না। আমাকে এ শক্তি দাও, যাতে ঐ গৌরব বহাল রাখতে পারি।

সিজদায় আমার দেহ-মনসহ আমার পূর্ণ সত্তাকে তোমার নিকট সমর্পণ করে ধন্য হয়েছি। আমি একমাত্র তোমার নিকট আশ্রয় নিয়েছি। আমার আর কোন আশ্রয়ের প্রয়োজন নেই। আমি আর কোন শক্তির অনুগ্রহের ভিখারি হব না। আমি আর কোন শক্তির পরওয়া করব না। সিজদায় তোমার যে মহান নৈকট্য লাভ করেছি, এটাই আমার মহা-সম্পদ। আমাকে তোমার গোলাম হিসেবে কবুল করে নাও। আমাকে তোমার সালেহ বান্দাহগণ, মুখলিস দাসগণ ও অগ্রবর্তী মুকাররাবীনের মধ্যে শামিল কর।

وَاجْعَلْنِى مِنَ الصّٰلِحِيْنَ وَالْمُخْلِصِيْنَ وَالسّٰبِقِيْنَ الْمُقَرَّبِيْنَ -

নামাযের দেহ

সবাই যার যার শরীরকে সুন্দর অবস্থায় রাখার চেষ্টা করে। নামাযের দেহটিকেও মুনিবের নিকট সুন্দর অবস্থায় পেশ করার জযবা থাকা উচিত। নামাযের দেহের সৌন্দর্য হলো ঃ

ক. নামাযে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যেখানে যেভাবে রাখা উচিত সেভাবে রাখা।
খ. নামাযে যা পড়া হয় তা শুদ্ধ উচ্চারণে পড়া।

নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় হাত বেঁধে স্থির হয়ে দাঁড়াতে হয়। সিজদা দেওয়ার জায়গায় দৃষ্টি রাখতে হয়। তাহলে মাথা সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে থাকবে। রুকুর অবস্থায় হাঁটুতে হাতের তালু রেখে হাত দিয়ে হাঁটুকে মযবুতভাবে ধরতে হয়। এতে শরীরের

www.bjilibrary.com

ভারটা হাতের উপর পড়ে এবং কনুই ও হাঁটু সোজা থাকে। দৃষ্টি পায়ের পাতার উপর রাখতে হয়। এতে কোমর, পিঠ ও মাথা এক রেখা বরাবর সমান থাকে এবং মাটির সমান্তরালে থাকে। মাথা পিঠ থেকে নিচু হয় না এবং পিঠ বাঁকা অবস্থায় থাকে না। রুকু থেকে উঠে সিজদায় যাওয়ার আগে স্থির হয়ে দাঁড়াতে হয় এবং দু'হাত দু'পাশে সোজা হয়ে থাকে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে না থেকে সিজদায় চলে গেলে নামায হবে না। এভাবে থামা ওয়াজিব।

সিজদায় যাবার সময় ধীরে ধীরে প্রথমে হাঁটু মাটিতে লাগাতে হয়, এরপর লম্বা হয়ে হাতের তালু মাটিতে রাখতে হয়, প্রথমে নাক ও পরে কপাল মাটিতে রেখে স্থির হতে হয়। এ সময় দৃষ্টি নাকের দিকে থাকে। এতটা লম্বা হয়ে সিজদা করতে হয় যাতে উরু খাড়া থাকে (সামনে বা পেছনে ঝুঁকে না থাকে) আর যেন উরু থেকে কনুই এতটা দূরে থাকে যে, এর ফাঁক দিয়ে ছাগলের বাচ্চা পার হওয়ার মত জায়গা থাকে। হাত পাঁজরের সাথে লেগে থাকবে না, একটু ফাঁক থাকবে।

তালু থেকে কনুই পর্যন্ত হাতটি মাটি থেকে উঁচু থাকবে (কুকুরের বসার মত কনুই মাটিতে লেগে থাকবে না)। সিজদার সময় দু'পায়ের পাতা খাড়া থাকবে এবং পায়ের আঙুলগুলো ভাঁজ করে কিবলামুখী করে রাখতে হবে। সিজদার সময় দু'হাতের আঙ্গুল ফাঁক ফাঁক হয়ে থাকবে না, কিবলামুখী রাখার জন্য মিলিয়ে রাখতে হবে। সিজদা থেকে উঠে দাঁড়ানোর সময় প্রথমে কপাল, পরে নাক, এরপর হাত এবং শেষে হাঁটু উঠাতে হবে।

দু'সিজদার মাঝখানে স্থির হয়ে বসে থামতে হয়। না থেমে আবার সিজদায় চলে গেলে নামায হবে না। এভাবে থামা ওয়াজিব। বসা অবস্থায় দৃষ্টি কোলের দিকে থাকবে। হাত হাঁটুর উপর এমনভাবে থাকবে, যেন আঙুলের মাথা কিবলামুখী হয়ে থাকে এবং আঙুল হাঁটুর নিচে ঝুঁকে না পড়ে। বসার সময় বাম পায়ের পাতা মাটিতে বিছিয়ে এর উপর বসতে হয় এবং ডান পায়ের আঙুলগুলোর উপর পায়ের পাতা খাড়া করে রাখতে হয়। দু'রাকাআত নামাযের পর তাশাহ্হুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পড়ার সময়ও এভাবেই বসতে হয়।

ডান পায়ের আঙুলগুলো খাড়া রেখে বসার উদ্দেশ্য বুঝতে হবে। জামাআতে নামাযের সময় কাতার সোজা রাখার উপর রাসূল (স) অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। নামাযে দাঁড়ানোর সময় পায়ের গোড়ালির দিক দিয়ে অন্যদের সমান হয়ে দাঁড়াতে হয়। পায়ের আঙুলের দিক দিয়ে সমান হয়ে দাঁড়ালে কাতার সোজা হবে না। কারণ পায়ের পাতা সবার সমান নয়। কারো পাতা লম্বা, কারো বেশ খাটো। কিন্তু গোড়ালি বরাবর দাঁড়ালে

www.bjilibrary.com

কাঁধের দিক দিয়েও বরাবর হয়।

কাতার সোজা রাখার প্রয়োজনেই নামাযে বসার সময় ডান পা স্থির রাখা দরকার। এক পা যদি এক জায়গায় স্থির থাকে তাহলে আবার দাঁড়ানোর সময় কেউ সামনে বা কেউ পেছনে চলে যাবে না। এক পা যদি এক জায়গায় স্থির না থাকে তাহলে পা সরে যাবার কারণে কাতার সোজা থাকবে না।

নামায শেষ করার উদ্দেশ্যে সালাম ফিরানোর সময় শুধু চেহারা ডান ও বাম দিকে ঘুরাবে। দেহ কিবলামুখীই থাকবে। মাথা নিচু করতে হবে না। স্থির সোজা বসা অবস্থায় শুধু চেহারা ডানে ও বামে ঘুরাতে হবে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উপরে বর্ণিত নিয়মে যত সঠিকভাবে পরিচালনা করা হবে এবং নামাযে যা কিছু পড়া হয় তা যত শুদ্ধভাবে পড়া হবে নামাযের দেহ ততই সুন্দর হবে।

"আল্লাহর রাসূল কীভাবে নামায পড়তেন" নামে আল্লামা হাফিয ইবনুল কায়্যিমের রচিত বইটি বাংলায় অনূদিত হয়েছে। এটা পড়লে এ বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান হাসিল করা যাবে।

নামাযের রূহ

নামায আদায়ের সময় মনের অবস্থার উপর নামাযের রূহ পয়দা হওয়া নির্ভর করে। নামাযে দেহ যখন যে অবস্থায় থাকে তখন মনে যে চেতনা থাকা উচিত তা থাকলেই নামায জীবন্ত হয়।

নামায শুরু করার সময় মুখে আরবীতে নিয়ত উচ্চারণের কোন দরকার নেই। এসব নিয়ত এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেখাননি। নিয়্যত মুখের কাজ নয়, মনের কাজ। তাই নামাযের উদ্দেশ্যে মন স্থির করে দাঁড়িয়ে আল্লাহু আকবার উচ্চারণ করতে হয়।

আল্লাহু আকবার বলে নামায শুরু করার সময় হাতের তালু কিবলামুখী রেখে হাত কাঁধের বরাবর যখন তোলা হয়, তখন মনে খেয়াল রাখতে হবে যে, আমি আমার দুনিয়ার জীবনকে পেছনে রেখে আমার রবের দরবারে হাযির হয়েছি। এ তাকবীরকে তাকবীরে তাহরীমা বলে। অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলে দু'হাত নাভির নিচে (আহলি হাদীস হলে বুকের উপর) বেঁধে দাঁড়ানোর পর নামাযের বাইরের হালাল কাজও নামাযের ভেতরে হারাম হয়ে যায়। এ কারণে এর নাম তাকবীরে তাহরীমা।

হাত বেঁধে মাথা সামান্য ঝুঁকিয়ে বিনয়ের সাথে নিম্নরূপ হামদ-সানা ও তায়াওউয

www.bjilibrary.com

পড়তে হয় ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ - اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ -

এটুকু পড়ার সময় মনে নিম্নরূপ খেয়াল রাখতে হবে ঃ "হে আল্লাহ! গৌরব, প্রশংসা, বরকত ও মর্যাদা তোমারই। আমি খাঁটিভাবে আমার সমগ্র মনোযোগ তোমার প্রতিই দিলাম।"

রাসূল (স) সূরা ফাতিহা পড়ার আগে কুরআনের নিম্ন আয়াতটুকুও পড়তেন ঃ

اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

কুরআনে وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ রয়েছে। তিনি নামাযে وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ পড়তেন। এ আয়াতের মর্মকথা খেয়াল করলে নামাযে এমন জযবা ও আবেগ সৃষ্টি হয়, যা নামাযের উদ্দেশ্যকে পূর্ণতা দান করে। এ আয়াতের মর্মকথা হলো ঃ হে আমার রব! আমার নামায, আমার কুরবানী ও যাবতীয় ইবাদত এবং আমার হায়াত ও মওত তোমারই জন্য। আমাকে তোমার নিকট সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করলাম।

বুকের বামদিকেই মানুষের কাল্‌ব বা দিল। সবটুকু মনোযোগ কাল্‌বের দিকে থাকবে। মনের খুঁটিটাকে কাল্‌বের উপর মযবুত করে গেড়ে দিতে হবে। শয়তান কাল্‌ব থেকে মনোযোগ সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেই থাকবে। নামাযীকেও বারবার মনোযোগ কাল্‌বে কেন্দ্রীভূত করতে হবে। শয়তানের সাথে এ যুদ্ধ চলতেই থাকবে।

এরপর আউযুবিল্লাহ ও বিস্‌মিল্লাহ পড়ে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করতে হবে। হাদীসে আছে যে, সূরা ফাতিহার এক এক অংশ তিলাওয়াত করার সাথে সাথে আল্লাহ্ এর জওয়াব দেন। এ হাদীসের কথাগুলো এমন আবেগময় ভাষায় বলা হয়েছে, যা বান্দাহর মনে গভীর দোলা দেয়। হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى قَسَمْتُ الصَّلٰوةَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِىْ مَا سَاَلَ - فَاِذَا قَالَ الْعَبْدُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اللّٰهُ

www.bjilibrary.com

تَعَالٰى حَمِدَنِىْ عَبْدِىْ وَاِذَا قَالَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَثْنٰى عَلَىَّ عَبْدِىْ فَاِذَا قَالَ مَالِكُ يَوْمِ الدِّيْنِ قَالَ مَجَّدَنِىْ عَبْدِىْ ـ فَاِذَا قَالَ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ قَالَ هٰذَا بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَاَلَ ـ فَاِذَا قَالَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ..... وَلَا الضَّآلِّيْنَ قَالَ هٰذَا لِعَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَاَلَ ـ

অর্থ ঃ হযরত আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি নামাযকে আমার ও আমার বান্দাহর মধ্যে দু'ভাগে ভাগ করেছি। আর আমার বান্দাহ আমার নিকট যা চায় তা-ই পাবে। বান্দাহ যখন বলে, "আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন", তখন আল্লাহ বলেন, "আমার বান্দাহ আমার প্রশংসা করল।" যখন বান্দাহ বলে, "আর রাহমানির রাহীম" তখন আল্লাহ বলেন, "আমার বান্দাহ আমার গুণ গাইল।" যখন বান্দাহ বলে, "মালিকি ইয়াওমিদ্দীন" তখন আল্লাহ বলেন, "আমার বান্দাহ আমার গৌরব বর্ণনা করল।" (মুসলিম)

যখন বান্দাহ 'ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন' বলে, তখন আল্লাহ বলেন, "এ বিষয়টা আমার ও আমার বান্দাহর মাঝেই রইল। আর আমার বান্দাহর জন্য তা-ই, যা সে চাইল।" (অর্থাৎ আমার ও আমার বান্দাহর মধ্যে এ চুক্তি হলো যে, সে আমার কাছে চাইবে, আর আমি তাকে দেব)।

যখন বান্দাহ বলে "ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম.......ওয়ালাদ্ দোয়াললীন," তখন আল্লাহ বলেন, "এটা আমার বান্দাহর জন্যই রইল, আর আমার বান্দাহর জন্য তা-ই, যা সে চাইল।"

এ হাদীসে মহব্বতের এমন অগ্নিকণা রয়েছে যে, বান্দার দিলে ঈমানের বারুদ থাকলে এবং নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার সময় আল্লাহর আবেগময় কথার দিকে খেয়াল করলে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার এমন আগুন জ্বলে উঠবে যে, জযবায় বান্দাহ নিজেকে মনিবের অতি কাছে বলে অনুভব করবে।

নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার সময় এ হাদীসটির কথা খেয়ালে রাখলে এক একটি আয়াত পড়ার পর আল্লাহর প্রেমময় জওয়াবটা মনের কানে শুনবার জন্য বান্দাহকে থামতেই হবে। আল্লাহর জওয়াবে যে তৃপ্তি ও শান্তি তা তারাই বোধ করতে পারে, যারা আয়াতগুলো ধীরে ধীরে মজা নিয়ে পড়ে।

সূরা ফাতিহা ও কিরাআত পড়ার পর রুকুতে যখন "সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম"

www.bjilibrary.com

তাসবীহ্ পড়া হয় তখন 'আমার রব' কথাটি যেন আবেগ সৃষ্টি করে। আল্লাহ্ তাআলা রাব্বুল আলামীন বা সারা জাহানের রব। অথচ 'আমার রব' বলা শেখানো হয়েছে, যাতে রবের সাথে নৈকট্য বোধ জাগে। তাসবীহ্‌টির অর্থ ঃ আমার মহান রব কত পবিত্র!

রুকু থেকে ওঠে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়,

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ .

এ সবটুকু পড়ার অভ্যাস করলে কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকার ওয়াজিবটা সহজেই আদায় হয়ে যায়।

এটা পড়ার সময় মাবূদের দরবারে মাথা নত করার তাওফীক দেওয়ার জন্য শুকরিয়ার গভীর অনুভূতি বোধ করতে হবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুতে থাকা অবস্থায় এমনসব দোয়া পড়তেন, যাতে বিনয়ের অনুভূতিটা গভীর হয়।

এর একটি দোয়া নিম্নরূপ ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ . اَنْتَ رَبِّىْ خَشَعَ لَكَ سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَمُخِّىْ وَعَظْمِىْ وَعَصَبِىْ .

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার জন্য রুকু দিলাম, তোমার প্রতি ঈমান আনলাম, তোমার প্রতি আত্মসমর্পণ করলাম, তোমার উপর ভরসা করলাম, তুমিই আমার রব। আমার কান, চোখ, মগজ, হাড় ও শিরা-উপশিরা তোমার প্রতি একাগ্রভাবে বিনয়ী হয়েছে।

এরপর সিজদায় চরম বিনয়ের ভাব নিয়ে পড়তে হবে,

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى .

"আমার মর্যাদাবান রব কতই পবিত্র!" রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা যখন সিজদা কর তখন তোমাদের রবের সবচেয়ে কাছে পৌঁছে যাও। তখন বেশি করে দোয়া কর।

ইসলাম মানে আত্মসমর্পণ। সিজদার অবস্থাটা আত্মসমর্পণের চূড়ান্ত বাস্তব রূপ। কপাল ও নাক মানুষের সবচেয়ে সম্মানজনক অঙ্গ। মহান প্রভুর উদ্দেশ্যে কপাল ও নাক মাটিতে রেখে গোটা দেহকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করে দেওয়া হয় সিজদায়।

www.bjilibrary.com

সিজদারত অবস্থায় মনে অনুভব করবে যে, আমার মহান রবের নিকট আমি ধরনা দিলাম। আমাকে যেন গোলাম হিসেবে তিনি কবুল করেন।

রাসূল (স) সিজদায় থাকাকালে বহু আবেগময় দোয়া করতেন। এর একটি দোয়া নিম্নরূপ ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ اَنْتَ رَبِّىْ ـ سَجَدَ وَجْهِىْ لِلَّذِىْ خَلَقَهٗ وَصَوَّرَهٗ وَشَقَّ سَمْعَهٗ وَبَصَرَهٗ تَبَارَكَ الَّذِىْ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ ـ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ তোমার জন্যই সিজদা করলাম। তোমারই উপর ঈমান আনলাম এবং তোমারই নিকট আত্মসমর্পণ করলাম। আর তোমারই ওপর নির্ভর করলাম, তুমি আমার প্রভু। আমার চেহারা ঐ সত্তার নিকট সিজদারত হলো, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন ও আকৃতি দান করেছেন এবং তাকে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন। আল্লাহ বরকতময়। তিনিই সকল স্রষ্টার সেরা।"

শিশু মায়ের কোলে আশ্রয় পেলে যেমন সেখানেই দীর্ঘ সময় থাকতে চায়, তেমনি সিজদায় আল্লাহর নৈকট্য বোধ হলে তাড়াতাড়ি সিজদা থেকে উঠতে মন চাইবে না। তাসবীহ ৩, ৫, ৭ যতবার খুশি পড়ার পর হাদীসের দোয়াগুলো থেকে নিজের বাছাই করা দোয়া সিজদায় পড়তে পরম তৃপ্তি বোধ হয়। রাসূলুল্লাহ (স) রুকু-সিজদায় কুরআনের দোয়া পড়তে নিষেধ করেছেন।

সিজদা থেকে উঠে স্থির হয়ে বসে পড়তে হবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاجْبِرْنِىْ وَارْفَعْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ ـ

এখানে সাতটি জিনিস চাওয়া হয়েছে। এর মধ্য থেকে কোন সময় তিনটি, কোন সময় আরও বেশি পড়া যেতে পারে। এটা পড়ার অভ্যাস করলে দু'সিজদার মাঝখানে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসার ওয়াজিবটুকু সহজেই আদায় হয়ে যায়।

এ দোয়াটির অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে মাফ কর, আমার উপর রহম কর, আমাকে শক্তিশালী কর, আমার মর্যাদা বৃদ্ধি কর, আমাকে হেদায়াত দান কর, আমাকে সুস্থ রাখ ও আমাকে রিয্ক দাও।

এ দোয়াটি বড়ই মূল্যবান। এতে ৭টি বড় বড় নিয়ামত চাওয়া হয়েছে, যা সবারই কাম্য হওয়া উচিত।

রাসূল (স) সিজদা থেকে উঠে দাঁড়ানোর সময় মাটিতে হাত দিয়ে উঠতেন না; হাঁটু

www.bjilibrary.com

ও উরুতে হাত দিয়ে দাঁড়াতেন। (বৃদ্ধ লোকেরা অবশ্য মাটিতে হাতের ভর না দিয়ে উঠতে পারে না)।

এভাবে দু'রাকাআত পড়তে হয়। দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা ফাতিহার আগে বিসমিল্লাহ পড়া উচিত। রাসূল (স) দ্বিতীয় রাকাআতে আউযুবিল্লাহ পড়তেন বলে প্রমাণিত নয়। অনেকেই বিসমিল্লাহকে সূরা ফাতিহার অংশ মনে করেন। তাই বিসমিল্লাহ পড়াই নিরাপদ।

দু'রাকাআত পড়া হলেই বসতে হয়। দু'রাকাআতবিশিষ্ট নামাযে এ বৈঠক ফরয। আর তিন বা চার রাকাআতবিশিষ্ট নামাযে দু'রাকাআতের পর বসা ওয়াজিব এবং শেষ বৈঠক ফরয।

এখানে যা পড়তে হয় এর নাম তাশাহ্হুদ ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ـ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ـ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

অর্থ ঃ সকল সম্মানজনক সম্বোধন, বরকত ও পবিত্রতা আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার উপর শান্তি, আল্লাহর রহমত ও বরকত নাযিল হোক। আমাদের উপর ও আল্লাহর নেক বান্দাহদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর দাস ও রাসূল।

আত্তাহিয়্যাতের কথাগুলো সম্পর্কে একটি চমৎকার ইতিহাস রয়েছে। রাসূল (স) মি'রাজে যখন আল্লাহর সাথে কথোপকথনের সুযোগ পেলেন, তখন তিনি প্রথমে আল্লাহকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ـ

এর জওয়াবে আল্লাহ বললেন ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ـ

রাসূল (স) তখন আল্লাহ থেকে পাওয়া সালাম একাগ্রহণ না করে আল্লাহর সকল নেক বান্দাহর নিকট পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে বললেন ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ـ

www.bjilibrary.com

আল্লাহ ও রাসূলের মধ্যে সালাম বিনিময়ের পর ফেরেশতারা বলে উঠলেন ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

মি'রাজের এ মহান স্মৃতিটুকু নামাযীকেও মি'রাজের স্বাদ উপভোগের সুযোগ দেয়। এখানে নামাযী আল্লাহ, রাসূল ও আল্লাহর সব নেক বান্দাহকে সালাম পৌঁছানোর সৌভাগ্য লাভ করে।

এ ঘটনাটি সহী হাদীস দ্বারা প্রমাণিত না হলেও এর ভাষা ঐ ঘটনার সাথে যেভাবে খাপ খায়, তাতে ঘটনা সঠিক বলে মন সাক্ষ্য দেয়। প্রথম বাক্যের সাথে দ্বিতীয় এবং দ্বিতীয় বাক্যের সাথে তৃতীয় বাক্যের কথাগুলো ঐ ঘটনা ছাড়া খাপছাড়াই মনে হয়।

বিখ্যাত তাফসীরে কুরতুবীতে সূরা আল বাকারার শেষ আয়াতের তাফসীরে মি'রাজের সাথে তাশাহ্হুদের সম্পর্ক ঐভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে, যেভাবে উপরে বর্ণিত হয়েছে। (দারুল ইফতার মুফতী মাওলানা আবদুল মান্নান থেকে এ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে)।

তাশাহ্হুদের পর দরূদ এবং দরূদের পর নামাযের শেষ দোয়াটি নিম্নরূপ ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আমার নাফসের উপর অনেক যুলম করেছি (মানে অনেক গুনাহ করেছি), তুমি ছাড়া আর কেউ তা মাফ করতে পারে না। সুতরাং তোমার পক্ষ থেকে আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার উপর রহম কর। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

নামায শেষ করার পূর্বে এ দোয়াটি ছাড়া আরও বহু দোয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সময় পড়তেন। সব দোয়ার মধ্যে এ দোয়াটিই প্রায় সবাই পড়ে। এ দোয়াটি বান্দাহর জন্য বড় সম্বল। বান্দাহর তো হামেশাই গুনাহ হতে থাকে। তাই মাফ চাইতে থাকাই উচিত। মুমিন হিসেবে এক মুহূর্তও আল্লাহকে ভুলে থাকা উচিত নয়। ভুলে থাকলেই মনে এমনসব খেয়াল আসে, যা মুমিনের জন্য মোটেই সাজে না।

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা আল্লাহকে লজ্জা কর। সবাই বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো লজ্জা করি। রাসূল (স) বললেন, আল্লাহকে লজ্জা করার মানে হলো, তোমার মগজকে পাহারা দাও, যেন এমন চিন্তা সেখানে না ঢুকে, যা আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয়। তোমার পেটকে পাহারা

www.bjilibrary.com

দাও, যাতে এমন খাবার সেখানে না ঢুকে, যা হালাল নয়। আর মৃত্যুকে বেশি করে ইয়াদ কর।

অর্থাৎ এমন ভাবনায় সব সময় থাকতে হবে যে, আল্লাহ আমাকে দেখছেন এবং আমার মনের খবরও তিনি রাখেন। এ অবস্থায় এমন চিন্তা আমি কেমন করে মগজে স্থান দিতে পারি, যা মন্দ এবং এমন খাদ্য কেমন করে আমি খেতে পারি, যা হারাম। এ লজ্জাবোধকে রাসূল (স) ঈমানের শাখা বলেছেন।

সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করার পর রাসূলুল্লাহ (স) বিভিন্ন সময় বহু দোয়া পড়তেন। এসব দোয়ার মর্মকথা হলো মাফ চাওয়া, দয়া ভিক্ষা করা, আল্লাহর নৈকট্য কামনা করা ও সব অবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা রাখা।

নামায শেষ হলে তিন তাসবীহ পড়ার উপর রাসূল (স) বেশ গুরুত্ব দিয়েছেন। একদিন রাসূল (স) হযরত মুয়ায (রা)-কে তিনবার বলেন, "মুয়ায তোমাকে আমি ভালোবাসি। প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ, ৩৩ বার আল্লাহু আকবার এবং ১ বার لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ . لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ . পড়তে ভুলবে না।

এ তাসবীহগুলো পড়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে, প্রতিটি তাসবীহই তাওহীদের ঘোষণা। কুরআনে সুবহানাল্লাহ তাসবীহটি শিরকের প্রতিবাদেই ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ . سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ .

আলহামদুলিল্লাহ মানে সকল প্রশংসা শুধু আল্লাহর জন্য, আর কোন সত্তা এর অধিকারী নয়। আল্লাহু আকবার তো স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করে যে, আর কোন সত্তা এর চেয়ে বড় নয়। এভাবে এ তাসবীহগুলো তাওহীদের ঘোষণা হিসেবেই উচ্চারণ করতে হবে।

এভাবে নামায আদায় করতে পারলেই নামাযে রূহ পয়দা হবে। নামাযের আসল অর্জনই হলো নামাযের রূহ। মৃত দেহ যেমন কোন কাজের নয়, নিষ্প্রাণ নামাযও আসল নামায নয়। প্রাণহীন নামাযে এর উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে না।

নামাযের জামায়াতে যত লোক শামিল হয়, তারা সবাই একই নামায পড়ে, কিরাআত ও তাসবীহ একই ভাষায় পড়ে, রুকু সিজদা একইভাবে করে, কিন্তু আল্লাহ এর সওয়াব কি সবাইকে এক সমানই দেবেন? হাদীস অনুযায়ী প্রত্যেক নেক আমলের পুরস্কার ১০গুণ থেকে ৭০০ গুণ দেওয়া হবে। একই সাথে যারা নামায আদায় করল তাদের

www.bjilibrary.com

কেউ ১০ গুণ, কেউ ২০, কেউ ২০০, কেউ ৫০০ গুণ কেন পাবে? কিসের ভিত্তিতে এত পার্থক্য হবে?

নামাযের দেহ কতটুকু সুন্দর হলো, যা কিছু পড়া হয় তা কী পরিমাণ শুদ্ধ হলো, নামায আদায়ের সময় মনের অবস্থা কার কেমন ছিলো, নামাযে কার কতটা আবেগ ও আন্তরিকতা ছিলো ইত্যাদির পার্থক্যের কারণেই সওয়াবে কম-বেশি হবে। তাই এসব দিক দিয়ে নামাযের মানকে যাতে উন্নত করা যায় সে বিষয়ে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। উন্নতির কোন শেষ নেই। তাই প্রচেষ্টাও চলতেই থাকা উচিত।

নামাযের মর্যাদা

আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাতে সঠিকভাবে ঈমান আনার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, তা আল্লাহ তাআলা নিজেই আল কুরআনের সূরা নাস-এ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ মানুষের রব, বাদশাহ ও ইলাহ বা মাবূদ। কুরআনে আরও একটি সম্পর্কের কথা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। সেটি আরো আবেগময়। আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে ঈমানদারদের ওয়ালী বা অভিভাবক। জীবন্ত নামায আল্লাহর সাথে এ চার রকম সম্পর্ক মযবুত করতে থাকে। মুমিনের রূহানী তরক্কীর জন্য নামাযই সবচেয়ে বেশি কার্যকর। রাসূল (স) নামাযকে তাঁর চোখের মণি বলেছেন। কখনো কোন পেরেশানীর কারণ ঘটলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের মাধ্যমে প্রশান্তি বোধ করতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে বলেন ঃ

اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَامَ فِىْ صَلٰوتِهٖ فَاِنَّهٗ يُنَاجِىْ رَبَّهٗ اَوْ اِنَّ رَبَّهٗ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ـ

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত এ হাদীসটির অর্থ ঃ "তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন সে তার রবের সাথে গোপনে কথা বলে এবং তার রব তার ও কিবলার মাঝে বিরাজ করেন।"

জীবন্ত নামাযের বাস্তব অবস্থা এটাই। মুমিন দুনিয়াকে পেছনে রেখে নামাযে যখন দাঁড়ায়, তখন তার ও কিবলার মাঝে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ থাকে না। নামাযে যা কিছু পড়া হয় এ সবই আল্লাহর সাথে একান্তে বলা হয়। তাই এ সবই আল্লাহর সাথে গোপন সংলাপ।

নামায মুমিনের মি'রাজ কথাটি প্রচলিত আছে। সহীহ হাদীসে এ ভাষায় কথাটি না

www.bjilibrary.com

পাওয়া গেলেও উপরের হাদীসটি থেকে এ কথাটি নামাযের বেলায় প্রযোজ্য। পার্থক্য এটুকু অবশ্য রয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজে গিয়েছিলেন সশরীরে, আর নামাযে মুমিনের মি'রাজ হয় শুধু রূহানীভাবে। নামাযে আল্লাহরই সাথে নামাযীর সঙ্গোপনে সংলাপ চলে। এটা অন্তরে অনুভব করার বিষয়। নামায যতটা জীবন্ত হয় এ অনুভূতি ততই গভীর হয়।

বহু হাদীস থেকে জানা যায়, অগণিত ফেরেশতা নামাযের বিভিন্ন অবস্থায় রয়েছে। একদল ফেরেশতা শুধু দাঁড়িয়ে আছে, একদল শুধু রুকুতে আছে, একদল শুধু সিজদায় আছে। হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, কোন একদল ফেরেশতা পূর্ণ নামায আদায় করে।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে পূর্ণ নামায আদায়ের মাধ্যমে ফেরেশতার চেয়েও মর্যাদা দান করেছেন। তাই আল্লাহর সাথে বান্দাহর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ার জন্য নামাযই শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। জীবন্ত নামাযের মজা যারা পেয়েছে, তাদের নিকট নামাযই সবচেয়ে প্রিয়। নামাযেই আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়া যায়।

নামাযে দেহ ও রূহ নির্মাণের জন্য যা করণীয় তা প্রতি ওয়াক্তে এবং প্রতি রাকাআতে করা সম্ভব নয়। এর জন্য মনকে অবসর করে প্রয়োজনীয় যথেষ্ট সময় লাগিয়ে নামায আদায় করতে হয়। এর জন্য উপযুক্ত সময় হলো শেষ রাত। তাহাজ্জুদের অভ্যাস করতে পারলেই এটা সম্ভব ও সহজ মনে হবে। ৫ ওয়াক্তের নামাযে তাহাজ্জুদের মত নিরিবিলি পরিবেশ ও মানবিক প্রস্তুতি সম্ভব নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয নামাযের পর তাহাজ্জুদের নামাযকেই সকল নফল নামাযের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছেন। তাহাজ্জুদ সম্পর্কে একটি হাদীস উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করি ঃ

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَّكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ وَمُكَفِّرٌ لِّلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الإِثْمِ ـ

অর্থ ঃ রাত জাগা তোমাদের কর্তব্য। কেননা এটা তোমাদের পূর্ববর্তী নেক লোকদের তরীকা, তোমাদের রবের নৈকট্যের মাধ্যম, আগের গুনাহর কাফ্ফারা এবং গুনাহ থেকে বিরত রাখার উপায়। (তিরমিযী)

রাসূল (স) এ হাদীসে তাহাজ্জুদের ৪টি ফযীলত বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে আল্লাহর নৈকট্য একটি। আল্লাহর দরবারে ধরনা দেওয়ার শ্রেষ্ঠ মাধ্যমই হলো নামায। আল্লাহর সাথে এটা বান্দাহর সরাসরি সম্পর্কের মহা সুযোগ।

www.bjilibrary.com

নামাযের রূহের দিকটাকে না বুঝলে নামায নিতান্তই একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হতে বাধ্য। এ প্রাণহীন নামাযে কী করে মজা পাওয়া যেতে পারে? এ জাতীয় নামাযই আমাদের সমাজে চালু আছে। এ কারণেই এ ধরনের নিষ্প্রাণ নামায দ্বারা নামাযের উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন, أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ "আমাকে স্মরণে রাখার জন্য নামায কায়েম কর।" (সূরা তোয়া-হা ঃ ১৪)

বারবার নামাযে হাযির হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। যাতে আল্লাহর কথা ভুলে না যায়, সেজন্যই বারবার নামায। নামায শেষ হলে দুনিয়ার দায়িত্ব পালনকালে কি আল্লাহকে ভুলে থাকার অনুমতি আছে?

সূরা জুমুআর ১০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

অর্থ ঃ যখন নামায শেষ হয় তখন যমীনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (রিয্‌ক) তালাশ কর। এ সময় আরও বেশি করে আল্লাহকে স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলতা লাভ করতে পার। এ আয়াতে নামাযের বাইরে আরও বেশি করে আল্লাহকে স্মরণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হাদীসে আছে, আল্লাহ বলেন, "বান্দাহ যখন আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সাথেই থাকি। যখন সে একা স্মরণ করে আমিও তখন একা তাকে স্মরণ করি। যখন সে কোন জামাআতে আমাকে স্মরণ করে তখন এর চেয়েও ভালো জামাআতে (ফেরেশতাদের মধ্যে) আমি তাকে স্মরণ করি। যখন সে আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে, আমি তখন তার দিকে একহাত এগিয়ে যাই। যখন সে এক হাত আমার দিকে এগিয়ে আসে আমি তার দিকে এক গজ এগিয়ে যাই। যখন সে আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তখন তার দিকে দৌড়ে যাই।

আল্লাহর সাথে বান্দাহর এ সম্পর্ক নামাযের মাধ্যমেই গড়ে উঠে ও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

বিতরের নামায

বিতরের নামাযের সঠিক সময় তাহাজ্জুদের পর। এ নামায ওয়াজিব। তাই শেষ রাতে যারা উঠার অভ্যাস করেনি তাদেরকে ইশার পরই বিতর পড়তে হয়, যাতে ওয়াজিব

www.bjilibrary.com

তরক হয়ে না যায়।

এ নামাযের তৃতীয় রাকাআতে দোয়া কুনুত পড়তে হয়। এ দোয়াটির অর্থের দিকে খেয়াল করলে বুঝা যায় যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভ করাই এর উদ্দেশ্য। দোয়াটি বড়ই আবেগময়। কুনুতে দুটো দোয়াই প্রচলিত। এর একটি হানাফী মাযহাব অনুসারী নামাযীদের মধ্যে এবং অপরটি আহলি হাদীসের মধ্যে প্রচলিত। দোয়া দুটোর অনুবাদ এখানে পেশ করা হলো ঃ

"হে আল্লাহ! আমরা তোমারই সাহায্য চাই। তোমারই নিকট ক্ষমা চাই, তোমারই প্রতি ঈমান রাখি, তোমারই উপর ভরসা করি এবং সকল মঙ্গল তোমারই দিকে ন্যস্ত করি। আমরা তোমার কৃতজ্ঞ হয়ে চলি, অকৃতজ্ঞ হই না। আমরা তোমার অবাধ্যদের সাথে সম্পর্ক রাখি না। হে আল্লাহ! আমরা তোমারই দাসত্ব করি, তোমারই জন্য নামায পড়ি এবং তোমাকেই সিজদা করি। আমরা তোমারই দিকে দৌড়াই ও এগিয়ে চলি। আমরা তোমারই রহমত আশা করি এবং তোমার আযাবকে ভয় করি। আর তোমার আযাবতো কাফিরদের জন্যই নির্ধারিত।

"হে আল্লাহ তুমি যাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছ, আমাকে সঠিক পথ দেখিয়ে তাদের মধ্যে শামিল কর। যাদেরকে ক্ষমা ও সুস্থতা দান করেছ, আমাকেও ক্ষমা ও সুস্থতা দান করে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর। তুমি যাদের অভিভাবক হয়েছ, আমাকেও তাদের মধ্যে শামিল কর। তুমি আমাকে যা দিয়েছ, তাতে বরকত দান কর। তোমার মন্দ ফায়সালা থেকে আমাকে রক্ষা কর। তুমিই আসল ফায়সালাকারী, তোমার উপর কারো ফায়সালা চলে না। তুমি যার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছ, তাকে কেউ অপদস্থ করতে পারে না। তুমি যাকে শত্রু সাব্যস্ত করেছ তাকে কেউ ইজ্জত দিতে পারে না। হে আমাদের রব! তুমিই বরকতময় ও মহান।"

এ দোয়া দুটো আরবীতে নিম্নরূপ ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ ـ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ـ

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ

www.bjilibrary.com

وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّمَا قَضَيْتَ اِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ
اِنَّهٗ لَايَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ ۔

নামাযে শুধু একটি দোয়া পড়লেই চলে, তবে দুটো পড়লেই তৃপ্তি বেশি হয়।

নামাযের প্রধান মাসআলা-মাসাইল

নামাযের নিয়ম-কানুন ও মাসআলা-মাসাইল অনেক। নামায শিক্ষার বইতে তা পাওয়া যায়। এখানে এ বিষয়ে শুধু বিশেষ জরুরি কথাগুলো পেশ করা হচ্ছেঃ

নামাযের ফরয ও ওয়াজিব কয়টি তা ভালোভাবে জানা প্রয়োজন। ফরয ও ওয়াজিব ছাড়া বাকি সবই সুন্নাত ও মুস্তাহাব। ফরয ও ওয়াজিবগুলো চিনে নিলেই চলে। এ সম্পর্কে তিনটি কথা জরুরি।

১. নামাযে কোন ফরয ভুলে বাদ পড়ে গেলে আবার নতুন করে নামায পড়তে হবে।

২. নামাযে কোন এক বা একাধিক ওয়াজিব ভুলে বাদ পড়ে গেলে নামায শেষ করার আগে সাহু সিজদা দিলেই নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে।

৩. ফরয ও ওয়াজিব ছাড়া অন্য কিছু বাদ পড়ে গেলেও নামায নষ্ট হবে না; যদিও ত্রুটিযুক্ত হবে।

তাই কোন্‌টা কোন্‌টা ফরয আর কোন্‌টা কোন্‌টা ওয়াজিব তা না জানলে সঠিকভাবে নামায আদায় করা সম্ভব নয়।

নামাযে ১৪টি ফরয

নামাযে মোট চৌদ্দটি ফরযের মধ্যে নামায শুরুর আগেই ৭টি ফরয, আর নামাযের ভেতরে ৭টি ফরয।

নামাযের বাইরের ৭টি ফরয

শরীর পাক, পরনের কাপড় পাক, নামায পড়ার স্থান পাক, সতর ঢাকা, কিবলা রোখ হওয়া, ওয়াক্ত চিনে নামায পড়া ও নিয়্যত করা।

নামাযের ভেতরের ৭টি ফরয

তাকবীর তাহরীমা, দাঁড়ানো, কিরাআত, রুকু, সিজদা, শেষ বসা ও মুসল্লীর ব্যক্তিগত কাজের মাধ্যমে নামায শেষ করা। এক্ষেত্রে সালাম সর্বোত্তম কাজ।

www.bjilibrary.com

সব নামাযে মোট ১১টি ওয়াজিব

১. সূরা ফাতিহা পড়া,
২. সূরা ফাতিহার পর কুরআনের আরও কিছু পড়া,
৩. রুকু'তে কিছুক্ষণ বিলম্ব করা,
৪. রুকু' থেকে উঠে স্থির হয়ে দাঁড়ানো,
৫. সিজদায় কিছুক্ষণ বিলম্ব করা,
৬. দু'সিজদার মাঝে স্থির হয়ে বসা,
৭. প্রত্যেক বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়া,
৮. সালাম শব্দ দ্বারা নামায শেষ করা,
৯. ফরয ও ওয়াজিবগুলো তারতীব মত আদায় করা,
১০. ফরয নামাযে ফজর, মাগরিব ও ইশায় আওয়াজ করে কিরাআত পড়া এবং যোহর ও আসরে আওয়াজ না করা।
১১. তা'দীলে আরকান অর্থাৎ নামাযের রুকনসমূহ (কিরাআত, রুকু, সিজদা) ধীরে-সুস্থে আদায় করা।

অতিরিক্ত আরও ৩টি ওয়াজিব

১. তিন ও চার রাকাআতের নামাযে দু'রাকাআতের পর বসা।
২. বিতরের নামাযে দোয়া কুনুত পড়া।
৩. দু'ঈদের নামাযে তাকবীর পড়া।

নামাযে সমস্যা

নামায শেখার সময় মনে কোন্ অবস্থায় কী চেতনা রাখতে হবে তা না শেখায় এবং চেতনা ছাড়াই নামায পড়ায় অভ্যস্ত হওয়ায় নামাযে মনকে হাযির রাখা বিরাট সমস্যা মনে হয়। মনকে নামাযে ধরে রাখার চেষ্টা সত্ত্বেও বারবার মন নামাযের বাইরে চলে যায় এবং নামাযের বাইরের খেয়াল মন দখল করে নেয়।

এর প্রতিকারের জন্য তিনটি কাজ করতে হবে ঃ

১. আগেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, মনটাকে কাল্‌বের মধ্যে গেড়ে রাখতে হবে। নড়ে গেলে আবার মযবুত করতে হবে। মনটাকে কাল্‌বে আটকে রাখার জন্য অবিরাম চেষ্টা করতে হবে।

২. নামাযে যা কিছু পড়া হয় তা এমনভাবে উচ্চারণ করতে হবে, যেন নিজের কানে শুনা যায়। মনোযোগ রাখার জন্য এটা অবশ্যই সহায়ক। তবে এতটা জোরে পড়া

www.bjilibrary.com

উচিত নয় যে, অন্য লোক শুনতে পায়।

৩. নামাযে যে অবস্থায় যে চেতনা থাকা প্রয়োজন বলে আলোচনা করা হয়েছে তা অভ্যাস করতে হবে।

এভাবে কাল্‌ব, মুখ ও কানের সমন্বয় সাধন করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন মনের অজান্তে মুখে উচ্চারণ না হয় বা বেখেয়ালীর মধ্যে পড়া না হয়।

জীবন্ত নামাযের নমুনা

রাসূল (স)-এর নামায

১. অন্তরের প্রশান্তি, "নামাযকে আল্লাহ তাআলা আমার জন্য চোখের শান্তি বানিয়েছেন।" (হাদীস)

২. পেরেশান অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের মাধ্যমে স্বস্তি বোধ করতেন, "নামায ও সবরের মাধ্যমে সাহায্য চাও।" (সূরা বাকারা ঃ ৪৫)

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "প্রত্যেক নবীর জন্য আল্লাহ একটা করে খাহেশ পয়দা করেছেন, আমার খাহেশ রাতের নামায। আল্লাহ প্রত্যেক নবীর জন্য একটি মর্যাদার লুকমা বানিয়েছেন, ৫ ওয়াক্তের নামায আমার লুকমা।"

৪. দীর্ঘ সময় দাঁড়ানোর ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পা বা হাঁটু অবশ হয়ে যেত।

সাহাবায়ে কেরামের নামায

১. হযরত আবূ বকর (রা) খুঁটির মত নিশ্চল হয়ে নামাযে দাঁড়াতেন।

২. বল্লমের আঘাতে বেহুঁশ থাকা অবস্থায় হযরত ওমর (রা)-কে নামাযের কথা বললে তিনি হুঁশ ফিরে পান।

৩. হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারীদেরকে লক্ষ্য করে তাঁর বিবি বললেন, "তোমরা এমন লোককে হত্যা করলে, যে রাতের নামাযে কুরআন খতম করতেন।"

৪. হযরত আলী (রা)-এর পায়ে বিদ্ধ তীর সিজদারত অবস্থায় সহজে খোলা গেল।

৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) অসুস্থ অবস্থায় চোখের চিকিৎসা ত্যাগ করলেন, কারণ চিকিৎসক সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত সিজদা দিতে নিষেধ করেছিলেন।

www.bjilibrary.com

৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) নিশ্চল থামের মত দাঁড়াতেন এবং বলতেন এটাই খুশু'।

৭. হযরত আবূ তালহা আনসারী (রা) বাগানে নামাযের সময় পাখির দিকে খেয়াল করায় রাকাআতের সংখ্যা ভুলে যাওয়ার কাফফারা হিসেবে ঐ বাগানটাই আল্লাহর পথে খরচ করার জন্য রাসূল (স)-কে দিয়ে দিলেন।

৮. এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর নিকট উপদেশ চাইলে তিনি বললেন, "যখন নামাযে দাঁড়াবে, জীবনের শেষ নামায মনে করে পড়বে।"

নামাযের শেষে দোয়া

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমাম হিসেবে নামায পড়ালে নামাযের শেষ দিকে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ বলে নামায শেষ করে মুসল্লীদের দিকে মুখ করে বসতেন, যাতে যারা শেষ দিকে নামাযে শরীক হয়েছে, তারা বুঝতে পারে যে, জামাআত শেষ হয়ে গেছে। ঘুরে বসার সময় তিনি আওয়ায দিয়ে আল্লাহু আকবার এবং তিনবার আসতাগফিরুল্লাহ বলতেন।

"আল্লাহর রাসূল (স) কিভাবে নামায পড়তেন" নামক বইটি থেকে বিস্তারিত জানা যায় যে, এ সময় তিনি কী কী দোয়া পড়তেন। এসব দোয়ার কথাগুলোও আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করায় সহায়ক।

আসলে মুমিনের জীবনটা আল্লাহময় হোক, এটাই নামাযের উদ্দেশ্য। আল্লাহ সব সময় দেখছেন এবং মনে যা চিন্তা-ভাবনা আসে তা সবই তিনি জানেন, এ চেতনা সবসময় মুমিনকে পরিচালিত করুক।জীবন্ত নামাযের এটাই লক্ষ্য।

কুরআন ও হাদীস থেকে অনেকগুলো দোয়া বাছাই করে আমি একটি ছোট সংকলন তৈরি করেছি। বই আকারে 'আল্লাহর দরবারে ধরনা' নামে তা প্রকাশিত। নামাযের ভেতরে ও বাইরের জন্য অনেক আবেগময় দোয়া এ সংকলনে রয়েছে। আমি ৫ ওয়াক্ত নামাযের জন্য দোয়া বাছাই করে নামাযের শেষে আল্লাহর দরবারে পেশ করি। প্রত্যেকেই তার পছন্দ মত দোয়া বাছাই করে নিতে পারেন। একসাথে সব দোয়া মনে থাকে না। এভাবে নির্দিষ্ট করে নিলে মনে থাকে।

নামায ও নামাযের বাইরের জীবন

নামায ও নামাযের বাইরের জীবনে স্বাভাবিক কারণেই একটা সম্পর্ক গড়ে উঠে। নামায যে মানের হয় সে মানেই বাইরের জীবনে এর প্রভাব পড়ে। যে নামাযকে শুধু

www.bjilibrary.com

একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান মনে করে তার জীবনে নামাযের কোন ইতিবাচক প্রভাব পড়ার কথা নয়। কিন্তু যে নামাযকে কালেমায়ে তাইয়েবার ওয়াদা অনুযায়ী চলার ট্রেনিং হিসেবে গ্রহণ করে তার জীবনে নামাযের প্রভাব অবশ্যই পড়বে। নামায যে পরিমাণ জীবন্ত হবে, সে পরিমাণ ইতিবাচক প্রভাবই নামাযীর বাস্তব জীবনে পড়বে।

সচেতন নামাযী সহজেই উপলব্ধি করতে পারবে যে, নামাযের প্রভাব তার জীবনে কতটুকু পড়ছে। নামাযের বাইরের জীবনের প্রভাবও নামাযের উপর পড়ে। বাস্তব জীবনে নামাযী যে পরিমাণ তাকওয়া অবলম্বন করতে সক্ষম হয়, সে পরিমাণেই নামাযের সময় তা প্রতিফলিত হয়। নামাযের বাইরে ঈমানের দাবি পূরণ করতে পারলে নামাযের সময় ঈমান-বিরোধী কোন ভাব মনে জাগবে না।

আমরা এটা রোজ যাচাই করে দেখতে পারি। বাইরের জীবনে বিবেকের বিরুদ্ধে কিছু করলে ওটা নামাযের সময়ও মনকে কলুষিত করবে। এ হিসেবে আমরা বলতে পারি যে, আমার নামাযে বাইরের জীবনের রিপোর্ট আসে এবং বাইরের জীবনেও নামাযের রিপোর্ট পাওয়া যায়। নামায ও বাস্তব জীবন পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

নামাযের বাইরে মনকে কী কাজ দেওয়া যায়?

নামাযের মাধ্যমে মনের যে ব্যাপক ট্রেনিং হয় এর সুফল যাতে বহাল থাকে সে উদ্দেশ্যে নামাযের বাইরে মনকে এমন কাজ দিতে হবে, যাতে মন শয়তানের খপ্পরে না পড়ে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে আমরা যখন কাজ করি তখন ঐ কাজটি ভালোভাবে সমাধা করার জন্য মনোযোগ দিয়েই কাজটি করতে হয়। অবশ্য এটা কাজের ধরনের উপর অনেকটা নির্ভর করে। কৃষক ও শ্রমিকদেরকে শুধু হাত-পা ব্যবহার করে গতানুগতিক ধরনের এমন কাজও করতে হয়, যে কাজে মনের তেমন কোন দায়িত্ব থাকে না। রিক্সাওয়ালার দেহ রিক্সা টেনে নিয়ে যাবার সময় এ কাজে মনের তেমন কোন দায়িত্ব নেই বলে তখন হাজারো ভাব মনে জাগতে পারে।

কিন্তু হাত যখন কলম দিয়ে লিখে তখন মন এ কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, মুখ যখন বক্তৃতা করে অথবা কান যখন বক্তৃতা শুনে তখন মন এ কাজেই শরীক থাকে।

তাই আমাদেরকে হিসাব করতে হবে যে, দেহ যে কাজ করছে সে কাজে মনের দায়িত্ব কতটুকু আছে। যে কাজের সময় মন বেকার থাকে তখন তাকে কাজ দেওয়া প্রয়োজন। তা না হলে আমাদের অজান্তেই ইবলীস তাকে বাজে কাজে বেগার খাটাবে।

www.bjilibrary.com

এটাই মানবজীবনের বিরাট এক সমস্যা। মন অত্যন্ত শক্তিশালী যন্ত্র। এর যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা অসীম। কাজ ছাড়া এক মুহূর্তও সে থাকতে পারে না। তাকে সব সময়ই কাজ দেওয়ার যোগ্যতা অনেকেরই নেই। ফলে আমাদের এ মূল্যবান কর্মচারী ইবলীসের বেগার খাটে।

আপনার দেহ কোথাও বসে বা দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে বা পায়চারি করে কাটাতে হচ্ছে। একা একা পার্কে বা রাস্তায় ভ্রমণ করছেন। যানবাহনের অপেক্ষায় স্টেশনে বসে বা কিউতে দাঁড়িয়ে আছেন। যানবাহনে চুপচাপ বসে আছেন বা বসার জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। দৈহিক পরিশ্রম করার পর ক্লান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে বসে বা শুয়ে আছেন। ঘুমের কামনায় বিছানায় চোখ বুজে পড়ে আছেন। এমন বহু সময় রোজই আমাদের জীবনে কেটে যায় যখন সচেতনভাবে আমরা মনকে কোন বিশেষ চিন্তায়, ভাবনায় বা পরিকল্পনা রচনায় ব্যবহার করি না। মনকে আমরা এভাবে যখনই বেকার রেখে দেই তখন সে ইবলীসের বেগার কর্মচারীতে পরিণত হয়।

এর প্রতিকার হিসেবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ইতিবাচক ও একটি নেতিবাচক উপদেশ দিয়েছেন। নেতিবাচক উপদেশটির সারমর্ম হলো, তোমরা আল্লাহকে লজ্জা কর। মনে এমন ভাব আসতে দিও না, যা আল্লাহ অপছন্দ করেন। আল্লাহ মনের গোপন ভাবও জানেন। তাই এ কথা খেয়াল রাখবে যে, এমন কথা আমি মনে কী করে স্থান দিতে পারি, যা আমার মনিব অপছন্দ করেন? এভাবে লজ্জাবোধ করলে মনকে বাগে রাখা যায়।

আর ইতিবাচক উপদেশ হলো, জিহ্বাকে সব সময় আল্লাহর যিক্‌রে চলমান রাখা, যাকে হাদীসের ভাষায় رَطْبُ اللِّسَانِ বলে। মনে খারাপ ভাব আসতে না দিলে মুখের যিক্‌র মনকে যিক্‌রে মশগুল রাখবে। অর্থাৎ মন ও মুখ কোনটাই খালি রাখা নিরাপদ নয়। মুখের যিক্‌র মনকে যিক্‌র করতে সাহায্য করে।

মনকে দেওয়ার মত কোন কাজ না থাকলে তাকে যিক্‌রে ব্যস্ত করে দিতে হবে এবং এ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য মুখেও যিক্‌র জারি করা দরকার।

যিক্‌রের ব্যাপারে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, হাদীসে শুধু 'আল্লাহ, আল্লাহ' যিক্‌র কোথাও শিক্ষা দেওয়া হয়নি। আল্লাহ শব্দের সাথে আল্লাহর কোন একটি গুণ থাকা দরকার। যেমন সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইত্যাদি। সহীহ বুখারীর শেষে একটি চমৎকার তাসবীহ শেখানো হয়েছে।

www.bjilibrary.com

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ۔

অর্থ ঃ দুটো বাক্য এমন আছে যা মুখে উচ্চারণ করা খুব সহজ, কিন্তু দাঁড়িপাল্লায় বেশ ভারী এবং আল্লাহর নিকট বড় প্রিয়। তা হলো, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, সুবাহানাল্লাহিল আযীম।

কতক বাস্তব পরামর্শ

খালি মনকে কাজে ব্যস্ত রাখার জন্য কতক পরামর্শ পেশ করছি ঃ

১. সব সময় সব অবস্থায় ইসলামী বই সাথে রাখুন, যখনই মন অবসর হয়ে যায়, বই পড় ন। এটা যিক্‌র থেকেও বেশি কার্যকর পন্থা। যিক্‌রে মনোযোগের অভাব হতে পারে। বই পড়ার সময় তা হয় না। তাছাড়া সকল রকম নফল ইবাদতের মধ্যে দীনের ইলম তালাশ করা শ্রেষ্ঠতম।

২. অনেক সময় বই পড়ার পরিবেশ বা সুযোগ থাকে না। তখন কয়েকটি কাজ করতে পারেন ঃ

ক. কুরআন পাকের মুখস্থ করা সূরাগুলো আওড়াতে থাকুন। পরিবেশ অনুকূল থাকলে গুনগুন করেই পড় ন।

খ. কালেমা তাইয়েবা, তিন তাসবীহ, দরূদ বা যে কোন যিক্‌র মুখে ও মনে জপতে থাকুন।

গ. আপনার করণীয় কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে করার পরিকল্পনা করুন। কারো সাথে আলোচনার কথা থাকলে বিষয়টি মনে মনে গুছিয়ে নিন।

ঘ. নিঃশ্বাস টানার সময় সচেতনভাবে ‘লা ইলাহা’ এবং নিঃশ্বাস ছাড়ার সময় ‘ইল্লাল্লাহ’ নিঃশব্দে মনে মনে পড়তে থাকুন।

ঙ. একটানা অনেকক্ষণ একই ধরনের কাজ করতে মন চায় না। তাই এসব কাজ অদল-বদল করে করতে থাকুন।

নামায বহু কিছু শেখায়

১. যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে আদায় করে, নামায তাকে সারাক্ষণ আল্লাহর কথা স্মরণ করায়। সর্বদা নামাযের সময় সম্পর্কে তাকে সচেতন থাকতে হয়। সে যে

www.bjilibrary.com

একমাত্র আল্লাহর দাস, নামায তাকে সে কথা ভুলতে দেয় না।

আল্লাহ বলেন ঃ أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِي ঃ আমাকে মনে রাখার উদ্দেশ্যে নামায কায়েম কর। (সূরা তোয়া-হা ঃ ১৪)

২. যে মন-মানসিকতা ও জযবা নিয়ে নামায আদায় করতে হয়, নামাযের বাইরের তৎপরতার সময়ও ঐ মন-মানসিকতা ও জযবার প্রভাব জারি থাকে।

৩. নামায কড়াভাবে সময়ানুবর্তিতা শেখায়। বারবার যথাসময়ে নামাযের জামাআতে হাযির হওয়ার ফলে সব কাজই সময় মত করার অভ্যাস হয়।

৪. ঠিক মত ওযূ করা, মসজিদে হাযির হওয়া, ইমামের আনুগত্য করা, ঠিক ঠিক মত নামায আদায় করা ইত্যাদি নামাযীর জীবনে শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টি করে। সব কাজ গোছালোভাবে করার মানসিকতা গড়ে উঠে।

৫. নামায সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নিয়ম-নীতি মেনে চলার প্রশিক্ষণ দেয়। ইমামের আনুগত্যের মাধ্যমে নেতার আনুগত্যের ট্রেনিং হয়। ইমাম ভুল করলে শালীন ভাষায় লুক্মা দিয়ে ইমামকে সংশোধন করার মাধ্যমে সরকারের সমালোচনা করার ভদ্র-পদ্ধতির শিক্ষা লাভ হয়। নামায রাজনৈতিক ময়দানেও সুশৃঙ্খল ও শালীন হতে উদ্বুদ্ধ করে।

মুমিনের সাফল্যের হাতিয়ার

১. মুমিনকে মযবুতভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার সৈনিক। আমি আর কোন শক্তির পরওয়া করি না। আমার রব, বাদশাহ, ইলাহ ও অভিভাবক এমন এক মহান সত্তা, যার আশ্রয় নিলে আর কোন শক্তিকে ভয় করার দরকার হয় না।

আমার কিসের ভয়? আমি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে আগ্রহী। কারণ আমার রবের কাছে পৌঁছার ওটাই তো প্রবেশপথ। আমি শহীদী মৃত্যু কামনা করি। তাই দীনের কোন দুশমন আমাকে মেরে ফেলবে, সে ভয় করার প্রশ্নই উঠে না। মৃত্যু ভয়ই সকল দুর্বলতার মূল। আল্লাহর সৈনিকের মৃত্যু ভয় থাকতে পারে না।

২. মুমিনের সবচেয়ে মযবুত হাতিয়ার হলো জীবন্ত নামায। যার নামায জীবন্ত সে আল্লাহর নৈকট্যের অনুভূতি নিয়ে তৃপ্ত। এ সম্পদের কোন তুলনা নেই। তার নিকট দুনিয়া তুচ্ছ। সবর ও নামায দ্বারা আল্লাহর সাহায্য চাওয়ার নির্দেশ আল্লাহ নিজেই দিয়েছেন।

www.bjilibrary.com

৩. ইকামাতে দীনের আন্দোলনে জান ও মাল দিয়ে সর্বদা সক্রিয় থাকতে হবে। সর্বাবস্থায় পরম সবরের সাথে ইসলামী সংগঠনে সক্রিয় থেকে আল্লাহর নিকট বাইআতের দাবি পূরণ করতে হবে। সংগঠন ও আন্দোলন ঈমানী শক্তিকে বৃদ্ধি করতেই থাকে। এ বিষয়ে ঢিল দিলেই বিপদ। দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তির জন্য এ তিনটি হাতিয়ারই যথেষ্ট।

শেষকথা

হাদীসে আছে যে, বেহেশতবাসীদের একটি আফসোস ছাড়া বেহেশতে আর কোন মনোবেদনা থাকবে না। দুনিয়াতে যে সময়টা আল্লাহকে ভুলে থেকে কাটিয়ে দেওয়া হয়েছে, ঐ অবহেলার জন্যই আফসোস করতে থাকবে। বেহেশত তো ঐ চিরস্থায়ী বাসস্থানেরই নাম, যেখানে সামান্যতম দুঃখ-কষ্ট এমনকি অভাব পর্যন্ত থাকবে না। অথচ একটা বিষয়ে আফসোস থেকেই যাবে। আফসোস তো মনোবেদনারই সৃষ্টি করে। এ দুঃখটুকু থেকেই যাবে। সকলের বেলায় তা হয়তো সত্যি নয়। কিন্তু যাদের বেলায়ই হোক, এ বেদনাটুকুর অস্তিত্ব সত্য।

এ আফসোসের কারণ তালাশ করলে হাদীসের বিবরণ থেকে তা বুঝা যায়। আল্লাহর দীদারই বেহেশতের সকল নিয়ামতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নিয়ামত বলে বেহেশতবাসীরা মনে করবে। আল্লাহ তাআলাকে দেখতে পাওয়ার চেয়ে বড় তৃপ্তি আর কোনটাতেই তারা বোধ করবে না। আর সবাই সমান পরিমাণ সময় আল্লাহকে দেখতে পাবে না। যে দুনিয়ার জীবনে আল্লাহকে যত বেশি স্মরণ করেছে, সে তত বেশি সময় আল্লাহকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করবে। তাই যারা কম সময় দেখার সুযোগ পাবে, তারাই হয়তো ঐ রকম আফসোস করবে।

তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের ভিত্তিতে জীবনযাপনের সিদ্ধান্ত যারা নেয় তারা মানবসমাজে আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েমের জন্যই সংগ্রাম করে। আর এ সংগ্রামের পরিণামে আখিরাতে সাফল্যের আশা রাখে। এ সিদ্ধান্ত তাদের মন-মগজ ও চরিত্রকে এক বিশেষ ছাঁচে গড়ে তোলে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তারা নাফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে সচেষ্ট হয়।

যা হোক, আপনি ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় হোন বা না হোন, আখিরাতে মুক্তির কামনা তো নিশ্চয়ই করেন। তাহলে মনটাকে ইতিবাচক কাজ দিন। মনকে ইবলীসের বেগার কর্মচারী হতে দেবেন না। ইবলীস থেকে মনকে রক্ষা করতে সক্ষম হলে দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্য অনিবার্য।

www.bjilibrary.com

মনে রাখবেন, ইবলীসের বিরুদ্ধে এ সংগ্রাম মৃত্যু পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে। এ সংগ্রাম থেকে অবকাশ পাওয়ার উপায় নেই। তবে দীর্ঘ অনুশীলনের ফলে ধীরে ধীরে আল্লাহর মেহেরবানীতে ইবলীসের পরাজয় হওয়া অসম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলা সতর্ক করে বলেন ঃ

إِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ـ

"শয়তান তোমাদের দুশমন, তাকে দুশমনই মনে করবে।"

হযরত আদম (আ) বেহেশতে শয়তানের ধোঁকায় এ কারণেই পড়েছিলেন যে, তিনি শয়তানকে শত্রু মনে করতে ভুলে গেলেন। (সূরা ফাতির ঃ ৬)

সমাপ্ত

www.bjilibrary.com

জীবন্ত নামায

অধ্যাপক গোলাম আযম